কৌরব অনলাইন ৬৬
৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা

বহমান

প্রাকলিপি

বিজড়িত (এন্টট্যাঙ্গেলড) দুটি কণার মধ্যে যোগসূত্র আঁচ করতে গিয়ে বিব্রত আইনস্টাইন বলেছিলেন এ এক ভূতুড়ে ব্যাপার স্যাপার। ১৯৩৫ সালের এক প্রবন্ধে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার এই অসঙ্গতির কথা তিনি উল্লেখও করেন।

তিনি চান বা না চান এই আপাত অদ্ভূতুড়ে কাণ্ড অণুপরমাণুর জগতজুড়ে চলে। বিজ্ঞানীদের ভাবনায় তারা আবছায়া হয়ে ধরা দেয়। আলোছায়ার ইশারার দিকে ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখেন। শতাব্দীশেষে রিও ডি জেনেইরোর ফেডেরাল বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানীরা বিজড়িত আলোর কণা (ফোটন কণা) নিয়ে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হলেন। আলোর কণাগুলি যেন যমজ, একের ওপরে ক্রিয়ায় অন্যে প্রতিক্রিয়া দেখায়। আলো যেন সময়ের মাত্রা বরাবর হেঁটে এল। সে কি অতীতেও ঘুরে এল? টেলিট্রান্সপোর্টেশন তাহলে কি সফল হল বলে! কণার ক্ষেত্রে যা সত্য হয়ে ধরা দিল, বিস্তৃত বস্তু, যেমন মানবদেহ, তা বহু বহুগুণ জটিল হলেও ভবিষ্যতে কখনও সফল হবার সম্ভাবনা খুলে রাখে।

তাহলে মন? তার অস্তিত্ব? সে কি কণা না তরঙ্গ নাকি দ্বৈত চরিত্রের এক না-কিছু? তার বিজড়িত কণাদের তাহলে কি ধরা যায়? কেমন হবে সেই বার্তালাপ? কোথাও কোনো অতীত সময়ের অসীম রেখায় কাঁপতে থাকা মনের সঙ্গে যোগাযোগ হয়? কেমন হবে সেই আদান প্রদান? সরলরৈখিক? বিন্দুবৎ? নাকি একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে যুগ্ম বিচরণ?

এক বন্ধু, পদার্থবিদ ও দার্শনিকের কথা ইতিমধ্যে এসে পড়ে আমার কাছে। সে বলে, “কোয়ান্টাম তত্ত্ব শুধুমাত্র একটা তত্ত্ব নয়, বরং একটা নিটোল জীবনদর্শন। পেন পেন্সিল দিয়ে অঙ্ক কষে আর পরীক্ষাগারে কিছু ঘট ঘটাং করে যে প্রকৃতির এতটা গভীর তলদেশের হদিশ পাওয়া যাবে, সে কে জানত! কোয়ান্টাম মেকানিক্স এও শেখায় যে না-বোঝাটাও একটা বোঝা, জীবনটা মূলত না-বোঝার বা বহুভাবে বোঝার আনন্দ। সেলিব্রেটিং প্লুরালিজম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং। না-বোঝাও (মুর্খতা বা স্টুপিডিটি নয়) যে বোঝা তা এই নতুন জগত বীক্ষার দান।”

বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকা এলোমেলো ভাবনা-উপাত্তের অংশগুলি এইবারে যেন একটা প্যাটার্ন তৈরি করতে থাকে। একটি শব্দের খোলস ছাড়াতে বসলে অন্য একটি দূরবর্তী শব্দের খোলসে আপনা থেকেই পরিবর্তন ঘটতে থাকে। দুই বিন্দুর মধ্যে আপাত সরলরেখা বিভাজিত হয়। তা আরও ভাঙতে থাকে। প্রতিসাম্যের বদল ঘটে চলে। এক শব্দের বিন্দু থেকে উৎসারিত পথ নানা দিকে প্রবাহিত হয়, রাইজোম্যাটিক, গুচ্ছ আকারে, জটিল অথচ আন্তঃসম্পর্কের বুননঠাস তাতে লক্ষ করা যায়। ক্রমশ তার অবয়ব আধখানা তৈরি করতে থাকি বাকি আধখানা আপনিই গঠিত হতে থাকে। অথবা তারা বিজড়িত কণার মতোই আচরণ করে। জানা নেই।

আমি শুধু অপেক্ষায় থাকি ঠিক কখন এই প্রক্রিয়া আমার স্নায়ুতন্ত্রে অনুভূত হয়। এবং কোনো এক মুহূর্তে, যে মুহূর্তে আমি তাকে দেখতে চাইছি, সেই মুহূর্তে তার চেহারাটা আমার কাছে এক পাঠবস্তু হিসেবে ধয়া দেয়। হতে পারে প্রক্রিয়া তখনও নিরন্তর হয়ে চলেছে আনবিক স্তরে। হতে পারে শব্দাতীত অবিরল একটা ধারা ও তার ভেতরের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার তাৎক্ষণিক স্থিরচিত্রকে পাঠবস্তু হিসেবে ধরা হল। কীভাবে এই প্রক্রিয়া তা জানা নেই। শুধু উদ্দেশ্যটা জানা, তাকে অনুভূতির ওপর ভর করে অবলোকনের একটি চেষ্টা মাত্র।

শোনাবে, সেই ইতানোর গল্পটা,
বাচ্চা ষাঁড়ের সেই অদ্ভুত শব্দগুলো!
এখন নিশ্চয়ই চ্যাঁচামেচি নেই। আরাম করে কান পেতে শুনতে পারো।
ভেসে ভেসে লোকায়ত হলে!
তুমিও কি ঘুরে দাঁড়ালে, বাবা!
মৃত্যুকে দোসর করে হাঁটায় সাহস লাগে
প্ররোচনা ছাড়া পশম খুঁড়ে নেওয়া, হাসির মিহি আভাস,
বাসনাহীন স্থির, নিশ্চিত কম্পমান স্থিতি।
তৃণ ও বিশ্বাস অভ্যাসে জমিয়েছি যত
এতখানি সময়ের শেষে দেখি তার কিছুই নেই, কোথাও আছে হয়তো
রাস্তা পার হয়ে গেলে দেখা যাবে।
ভাবনার অতল সীমানায় স্থির নিরপেক্ষ স্বচ্ছ
স্বাভাবিক হয়ে কথা চলে অবিরাম।
কত কথা কতটা ভঙ্গী কতটা নির্বাসন

দূর থেকে ডাক দিল সে, ইতানো; বলে। অমনি
কোথা থেকে হুড়মুড় করে ছুটে এল, জানিস।
এখন জানি –
ডাক শোনার দরকার হয় না, শুধু ডাকের ভঙ্গী করলেই হয়...

এই সাঁকো পেরিয়ে হিল্লি দিল্লি যেখানে খুশিই চলে যাওয়া যায়।
কেউ কেউ নৌকো চেপেও যায়
আমি অবশ্য তাদের মতো সাহসী নই
ফলে নৌকো বেয়ে যেতে.... জলে আমার বড্ডো ভয়
মা বলে দিয়েছে জলে নাকি ফাঁড়া আছে।
সাঁকো পেরিয়ে দিব্যি যাওয়া যায়, তবে
সবসময় সেটার দেখা পাওয়া যায় না।
শীতের কুয়াশায়, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদে, তুমুল বর্ষায় স্পষ্ট দেখা যায়
তখন আমার বেরোতে এত কুঁড়েমি, পারি না

সন্ধে নামার আগে ফুরফুরে বাতাসে এক পা এক পা করে গিয়ে দেখতে পাই না
বাবাকে বলতে নিঃশব্দে হেসে এক হাত আমার কাঁধে রেখে বলল,
কী যে বলিস, রামকৃষ্ণদেবের গল্প পড়িসনি!
সেই যে চাষি হুট করে কাঁধে গামছা ফেলে....অমনি হুট করে যেতে হয়।
আমি তলিয়ে ভাবি। কথামৃত খুঁজে বারবার পড়ি।
হিমাদ্রিদাকে ডেকে বলি, রোজ রাতে ভাত আর ধুঁধুলের ঝোল? কী টেস্ট পান!
বলতেই নিঃশব্দে হেসে এক হাত আমার কাঁধে রেখে বলল,
কী যে বলো! গঙ্গাপুরী দেখোনি!
সেই যে ইঁদারার পাশে শান বাঁধানো দালান... সেইখানে বসে শালপাতায় ঝোল ভাত...
আমি তলিয়ে দেখি। বারবার ঘুরঘুর করি গঙ্গাপুরীর চারপাশে।

বাবার সঙ্গে দেখা হয় কম, হিমাদ্রিদার সঙ্গেও।
ওরাও কেমন ইশারা দিয়ে দিয়ে বলে।
কিছুতেই ভেঙে বলে না। আর হাসে কেবল।
খুব ভালো লাগে, প্রশ্ন টশ্ন তখন কোথায়!
মন জুড়িয়ে আসে, এটা সেটা জিজ্ঞেস করার কোনো দরকারই বোধ করি না।
সাঁকোটা না থাকলেও যেন আমার আর কিছু যায় আসে না।
আবার লোকে পারাপার করে, আমি আবার সাঁকোটাকে দেখি।
এই সাঁকো পেরিয়ে....

শাপভ্রষ্ট দানব দেখেছেন? বলেই বুক চওড়া করে দেখালেন ভদ্রলোক
এসবই মায়ার খেলা, কুহকও বলতে পারেন।
শুনশান রাত্রে দূরত্ব কমাবাড়ার মধ্যে ছুটন্ত লড়ির ঘাড় ধরে ঝুলে থাকে
এহ বাহ্য!
এই নিন। কুলকুচি করে দুদণ্ড স্থির হয়ে বসুন দেখি। তাড়া নেই।
ওপাশে সবার কাজ সারা হয়ে যাচ্ছে। এই দাগ পেরিয়ে আসবে তার জো নেই।
এই যে বসুন দেখি। ঝকমারি যা গেল! মিটে টিটে গেল যা হোক, আসুন দেখি...
বলেই চলেছেন ছদ্রলোক অথচ আমি তার যে উত্তরই দিই
শব্দগুলো তৈরি হবার আগেই ভেঙে গুঁড়িয়ে
গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে মাটিতে, পাটকাঠি ঘেরার ঠিক বাইরের চৌহদ্দিতে।
আমি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছি, আমায় আপনি বলছ কেন? ও মেজমামা, ও মেজমামা!

কে কার কথা শোনে, একমুখ দাড়িগোঁফওয়ালা হাসি
আমার বলা শব্দগুলোকে পালকের মতো উড়িয়ে দেয়
বাসি ন্যাতার মতো সমস্ত সম্ভ্রম পড়ে থাকে।

আর কোনো ব্যথা নেই জানিস!
এখন মায়ের বুকে কান পাতলে দুধ আসবার শব্দ পাই।
অনুপস্থিতির গাথা, কবি এরনানদেথের
ঠিক ওইরকম একাকার তুই আমি...
স্ফটিকের জালিকা বিছানো গোলকের চারধারে।
তবে যে বলে, পঞ্চভূতে... তবে? এই যে প্রাণন...চল্লিশ বছর ধরে...
আমায় মাঝপথে থামিয়ে দেয় শিবদা।
সময়ের পরতের পর পরত একত্রে লেপ্টে গেলে চল্লিশই বা কি আর চারলক্ষ
বিষণ্ণতা ছুঁয়ে ঝুলে থাকে চল্লিশ বছর, বাস-দুর্ঘটনা, মার্কশিট, হাসপাতাল
ঝকঝকে গভীর চোখ তুলে বলে শিব, বলে আমি টের পাই, কেননা
আমার চিবুক অমনি আকাশের দিকে ওঠে, চোখের অতলে এসে
স্ফটিকের আলোকণা জমে...
এভাবেই কি বলো, যে একাকার?
একই প্রশ্নের পর একই প্রশ্ন ওঠে, শেষ-না-হওয়া বর্তুলাকার কক্ষপথে
শিব হাসে, শিব হাসে নিঃশব্দে, আমার হাসির সজ্জায় মিশে
পরতের পর পরত তৈরি করে।

ফিরে পাওয়া গেছে সব। জানো?
ভাষা, কথা, গান, হাসি, স্মৃতি, চলন, দৃষ্টি, চিন্তা
যা যা আলঝাইমার কেড়ে নিয়েছিল
দিব্যি মনে করতে পারি বন্দিশগুলো, গুণগুণ করি
পাশাপাশি দুই নি নিঁখুত লাগিয়ে মিঁয়া কি মল্লারের টুকরো তুলে আনতে পারি
আমি আঙুলের গাঁট ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখি, গুরুজির হাতের আঙুল আরেকটু লম্বা
এই আপনার বাঁশির ওপর আঙুল লাগিয়ে বসলাম, বাজান দেখি!
কালোদির কথা মনে আছে, বলেছিলাম তোমায়, মুখোমুখি বসিয়ে
সে কি সুরেলা আওয়াজ, শরীর ছেড়ে দেয়... অবশ,

শীতলপাটির ওপর এলিয়ে যায় শরীর
তারপর গলে তরল, গড়াতে গড়াতে আধভেজা মাটির সঙ্গে মিশে থকথকে হয়ে ওঠে
আমার সামনেই তাতে চারটে কুমড়ো চারা, দুটো বেগুন একঝাড় পালং
ফনফন করে বেড়ে ওঠে,
শীতকাল এসে গেল, একটু আতর দিও বাঁশিতে, মুছে রেখো
লাল শালু মুড়িয়ে, সে তো তোমার আছেই...

কী করে আমায় খুঁজে পেলি বল তো!
যেভাবে নিজেকে খুঁজে পাই। সেও তো কঠিন বলো

আধ শতাব্দী পার হয়ে সাইকেল চলে এসেছে
আলো আসে অন্ধকার আসে দেহের অস্বচ্ছতার ভেতর রেণু রেণু
টের পাওয়াই তো সব
ট্রেনের দুলুনির ভেতর নীল আলো, ময়ূখ চৌধুরীর কমিক্স
তুমি ভাবলেই টের পাই আমি,
বুলগানিন এসেছিল পাড়ায়, ধামাচাপা দিতে
তোমার ইশারা আমার হাতের তালুতে এসে লাগল,
তরু তরু বলে সকলেই ভেঙে পড়ার মধ্যে আমি পেরিয়ে এলাম এতগুলো বছর
সেই আলোই তো এল, শরীরের দুলুনি অথবা স্বর, হুবহু
এমনটাই তো হবার কথা, খুঁজে পাওয়া...

উত্তরলিপি

ভাবনার সূত্র এক জায়গা থেকে শুরু হয়। দুটি কণার আন্তসম্পর্ক, যা খানিকটা ধোঁয়াশা, খানিকটা অনুভবযোগ্য, বাকিটা মেধার তালাশ। আন্তসম্পর্ক আসলে কিছু অসমাপ্ত গল্পের ইশারা! তাহলে মন? সেও তো রাসায়নিক অস্তিত্ব! তার অণুপরমাণুতেও এমন বিচলন ঘটে নিশ্চয়। তাহলে যে মানুষটা আপাতভাবে ইহজগতে নেই, যার অণুপরমাণু এই গ্রহের পরিবেশে কোথাও না কোথাও মিশে রয়ে গেছে, যার সঙ্গে আমার আত্মার যোগ, নাড়ির যোগ, মনের যোগ, সেই অণুপরমাণুর আন্তসম্পর্কের বয়ান কেমন হবে। আমার ক্রিয়ার সঙ্গে মিলিয়ে তাদের সমান্তরাল ক্রিয়া গঠনের প্রয়াস যদি কবিতার শরীরে বোনা যায়।

আপাতভাবে প্রাক ও উত্তরলিপি বাদ দিয়েও কবিতার পদগুলি পাঠ করা যায়। তবে এদুটি গদ্য ওই কবিতা পাঠবস্তুর জন্য ভারসাম্য পিনিয়নের কাজ করে। যেহেতু আমার অবস্থান জানা এবং অন্য প্রিয় মানুষটির ভাবনা-অবস্থানটি অজানা, এক্ষেত্রে কেবল স্বীকার করে নেওয়া তার অবস্থান কোনো না কোনো সময়ের ভাঁজে চূর্ণ আণবিক অবস্থায়। সংলাপ, বিপরীত সংলাপ সব ঊর্ধ্বকমাহীন, স্থান পরিবর্তনযোগ্য। যিনি পাঠ করবেন, তাঁর মস্তিষ্কের রসায়ন নতুন সজ্জায় তাকে গড়ে নিতে পারে বিলকুল। সুতরাং কবিতা-অংশের কোনো শিরোনাম নেই, ভাগযোগ নেই। যেভাবে ভাবনার স্রোত বয়ে চলে মগজে, শিরোনামহীন, ক্ষণিক বিরতি অথবা বিরতিহীন, তেমনই এই পাঠবস্তুর বিন্যাস। ভাষার রীতি মেনে, বাক-অভ্যাসের রীতি মেনে কেবল বাক্যগঠন, যতিচিহ্ন ও পংক্তির তফাত গড়ে দেওয়া হল।

ইহলোকে না-থাকা প্রিয় ও আপন এমন মানুষের কয়েকজনকে বেছে নিয়ে এই পরীক্ষামূলক পাঠটি রচনা করার চেষ্টা করা হল মাত্র।

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৬৯। শিক্ষায় ভূতাত্ত্বিক, নেশায় ঘোরতর এক পাহাড়ি। শান্তনুর লেখালিখির শুরুয়াত ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি। ‘কবিতা পাক্ষিক’ পত্রিকার সহসম্পাদনা করেছেন দীর্ঘদিন। বর্তমানে ‘জয়ঢাক’ প্রকাশনীর সাথে যুক্ত। উত্তরাধুনিক সাহিত্য নিয়ে শান্তনুর চিন্তাভাবনা অনেক, লেখালিখিও রয়েছে। কবিতা পাক্ষিক ও কৌরব পত্রিকায় অনেক পরীক্ষামূলক লেখ-প্রকল্প চালিয়েছেন। পরিবিষয়ী কবিতাচর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। অনেক গদ্যও লেখেন নিয়মিত, নানা পত্রপত্রিকায়, মূলত পাহাড় ও ভ্রমণ বিষয়ে; পাশাপাশি ছোটোদের জন্য বইলেখা, বইপ্রকাশ, পর্বতারোহীদের নিয়ে নানা সৃষ্টিধর্মি কাজে শান্তনু নিয়ত নিয়োজিত।